ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ

শ্রীসুধাংশুকুমার দাস

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১ কর্নওআলিস স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

১৯৫৫ সালে বোলপুরে ব্রাহ্ম সম্মিলনীর ৬৫তম বার্ষিক অধিবেশনে
সভাপতি পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি
শ্রীসুধাংশুকুমার দাসের অভিভাষণ

প্রকাশ মাঘ ১৩৬২

প্রকাশক শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। ২১১ কর্নওআলিস স্ট্রীট। কলিকাতা ৬
মুদ্রাকর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্মমিশন প্রেস। ২১১ কর্নওআলিস স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

এই ব্রাহ্ম সম্মিলনীর সভাপতিত্বে আহ্বান ক'রে আপনারা আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন, তার জন্য সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষ ও আপনাদের সবাইকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সভাপতিত্ব করবার যোগ্যতা আমার নেই—আমার পক্ষে এ শুধু মৌখিক বিনয়ের কথা নয়। আমি ভালো ক'রেই জানি যে, আমাদের সমাজে এখনও অনেকে রয়েছেন যাঁরা ভক্ত সাধক, বয়োজ্যেষ্ঠ ও জ্ঞানজ্যেষ্ঠ—যাঁদের যোগ্যতা সম্বন্ধে কারও কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবুও আপনারা আমাকে ডেকেছেন। অযোগ্য হস্তে যে গুরুভার আপনারা ন্যস্ত করেছেন তার দায়িত্ব আপনাদের।

দুটি কারণে আমি আপনাদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারি নি। ব্রাহ্ম সমাজে ও পরিবারে আমার জন্ম। যে সাধনা ও আদর্শ বাল্যে যৌবনে ও প্রৌঢ়ত্বের সীমানা পর্যন্ত আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে, সে সাধনা ও আদর্শ ব্রাহ্ম সমাজ ও ধর্মের সাধনা ও আদর্শ। নিজেকে ব্রাহ্ম ব'লে পরিচয় দিতে আমার মনে কখনও কোনো দ্বিধা বা সংকোচ আসে নি, বরং গৌরবই বোধ করেছি। কিন্তু তাই ব'লে অন্য ধর্ম ও ধর্মসমাজকে আমি অশ্রদ্ধেয় কিম্বা হেয় মনে করি না। সব ধর্মকেই অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করাও আমি ব্রাহ্মধর্ম থেকেই শিখেছি। সেই ব্রাহ্মসমাজের তরফ থেকে আপনারা আমাকে ডেকেছেন—কাজেই অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমি আপনাদের আহ্বান স্বীকার ক'রে নিয়েছি।

পাঠ্যাবস্থায় শুধু কয়েক বৎসর আমার কলকাতায় কেটেছে। বাংলার বাইরে, ব্রাহ্মসমাজের কর্মপ্রচেষ্টার মুখ্য স্রোতোধারার বাইরে, আমার জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে—নানাবিধ রাজকার্যে—ছোটো ছোটো সহর কিংবা গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে। সেই দিক থেকে

দেখতে গেলে আমি back waters থেকে এসেছি। ব্রাহ্মসমাজের নানা লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান রয়েছে যার সাথে আমার যোগ নিতান্ত সাময়িক ও পরিচয় স্বল্পদিনের। তাই আমি আজ এসেছি, আপনাদের সহায়তা ও সঙ্গলাভ করব, আপনাদের কর্মপ্রচেষ্টায় যথাশক্তি যোগদান করব, এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। তাই আমার প্রথম কথা এই যে, আমি আপনাদের শিক্ষার্থী সভাপতি। বৌদ্ধ সাধনায় যাদের স্রোতাপন্ন বলা হয়, আমি এখনও সেই অবস্থা অতিক্রম করি নি। জ্ঞান কিংবা ভক্তির পুঁজি ও সম্বল আমার স্বল্প। সেই স্বল্প পুঁজি নিয়ে আমি এসেছি এই ভেবে যে যা কিছু অভাব ও ত্রুটি আমার রয়েছে তা আপনারা নিজগুণে পূরণ করে দেবেন।

উৎসবের প্রারম্ভে, যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রাক্‌কালে, যজ্ঞাধিপতি উৎসব-দেবতাকে স্মরণ করতে হয়, আহ্বান করতে হয়, তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে হয়, এই আমাদের দেশের সনাতন রীতি। আজ প্রথমেই স্মরণ করি যিনি আমাদের সকলের পিতা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি, "তিনি কেবলমাত্র আমাদের বড়ো নন, তিনি আমাদের আপন, আমাদের পিতা। তিনি আমাদেরই বড়ো, আমরা তাঁরই ছোটো। তাঁকে প্রণাম ক'রে আমরা আমাদের বড়োকেই প্রণাম করি। এর মধ্যে বাইরের কোনো তাড়না নেই, জবরদস্তি নেই। যে বড়োর মধ্যে আমরা আছি, যে বড়োর মধ্যেই পরিপূর্ণ সার্থকতা, তাঁকে প্রণাম করাই একমাত্র স্বাভাবিক প্রণাম। কিছু পাব ব'লে প্রণাম নয়, কিছু দেব ব'লে প্রণাম নয়, ভয়ে প্রণাম নয়, জোরে প্রণাম নয়। আমাদেরই অনন্ত গৌরবের উপলব্ধির কাছে প্রণাম।" এই প্রণামটির মহত্ত্ব উপলব্ধি ক'রেই আজ আমরা প্রার্থনা করি, নমস্তেঽস্তু, তোমাতে আমাদের প্রণাম সার্থক হয়ে উঠুক।

তারপর স্মরণ করি ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীদের, যাঁদের সম্পদ আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। স্মরণ করি মহাত্মা রাজা রামমোহনকে যিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, বিশেষ ক'রে স্মরণ করি মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথকে যাঁর আশ্রমের সন্নিধানে আজ এই সম্মিলনীর অধিবেশন।

স্মরণ করি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্ম-সমাজের ঋষিদের, যাঁদের জীবনধারা এই সমাজকে পরিপুষ্ট ও বলশালী করেছে। তাঁদের আদর্শ ও জীবন আমাদের উদ্‌বুদ্ধ করুক, এই প্রার্থনা করি। ব্রাহ্মসমাজের কাজে আরো কত পুণ্যাত্মা নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন ও করেছেন, তাঁদের কথাও আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আমাদের সমাজ তাঁদের ঋষি ব'লে গ্রহণ করেছেন, যাঁরা—

সংপ্রাপ্যৈনম্‌ ঋষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরাঃ
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

"যাঁরা পরমাত্মাকে জ্ঞানের মধ্যে পেয়ে জ্ঞানতৃপ্ত, আত্মার মধ্যে মিলিত দেখে কৃতাত্মা, হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি ক'রে বীতরাগ, সংসারের কর্ম-ক্ষেত্রে দর্শন ক'রে প্রশান্ত, সেই ঋষিরা যাঁরা পরমাত্মাকে সর্বত্র হতেই প্রাপ্ত হয়ে ধীর হয়েছেন, সকলের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছেন এবং সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছেন।' এই ঋষিদের পেয়ে দেশ ধন্য হয়েছে—আমরা ধন্য হয়েছি। আজ আমাদের মধ্যে তাঁরা জাগ্রত হোন।

ব্রাহ্ম সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে যে তিনটি বিষয় বিশেষ ক'রে আমার মনে এসেছে, সেই তিনটি বিষয় আজ আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করতে চাই। সে তিনটি বিষয় হচ্ছে: প্রথমত ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজ; দ্বিতীয়ত ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজের ভবিষ্যৎ; তৃতীয়ত বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য।

ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজ

যে দুটি কারণে এই বিষয়টি আমার মনে এসেছে সে দুটি কারণ প্রথমেই উল্লেখ করি।

The Discovery of India নামক বইখানাতে পণ্ডিত নেহরু ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে বলেছেন—

"Repelled by some of the social customs and practices of Hinduism, many Hindus were attracted towards Christianity and some notable conversions took place in Bengal. An attempt was therefore made by Raja Ram Mohan Roy to adapt Hinduism to this new environment and he started the Brahmo Samaj on a more or less rationalist and social reform basis. His successor, Keshub Chander Sen gave it a more Christian outlook. The Brahmo Samaj influenced the rising middleclasses of Bengal but as a religious faith it remained confined to a few, among whom, however, were some outstanding persons and families. But even these families, though ardently interested in social and religious reform, tended to go back to the old Indian philosophic ideals of the Vedanta."

পণ্ডিত নেহরু চিন্তাশীল মনীষী ও পরম শ্রদ্ধাভাজন দেশনেতা। তাঁর অভিমত আমাদের প্রণিধানযোগ্য ও বিবেচ্য। গভীর অভিনিবেশ, অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মপরীক্ষা দ্বারা আমাদের ভেবে দেখতে হবে পণ্ডিতজীর অভিমতের যথার্থতা কিংবা সত্যাসত্য।

দ্বিতীয় কারণটি কতকটা স্থানীয় ও সাময়িক। আমরা আজ সম্মিলিত হয়েছি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আশ্রমের সন্নিকটে। ভারতীয় সংস্কৃতির যে ধারা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাধনায় পরিপুষ্ট হয়েছে সে সাধনার সাথে ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজের যোগের কথা আজ স্বতঃই মনে পড়ছে।

প্রশ্ন উঠছে : বাস্তবিকই ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্ম কি শুধু (১) একটি protestant movement or adaptation of Hinduism based on more or less rationalist and social reform basis ? কিংবা (২) Christian in outlook ? অথবা (৩) মুষ্টিমেয় পরিবার ও লোকের মধ্যে আবদ্ধ, যার গতিশীলতা ঔপনিষদিক বেদান্তের পরিধি কখনও অতিক্রম করে নি ? এই প্রশ্নগুলি আমাদের

সমাজের পক্ষে জীবন-মরণের প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজতে হ'লে ভারতীয় সংস্কৃতির মূলভিত্তি ও গোড়ার কথা আলোচনা করা দরকার। ব্রাহ্মধর্ম সার্বজনীন অথবা দেশকালে সীমাবদ্ধ ধর্ম—সে প্রশ্নের উত্তরও হয়তো উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

ভারতীয় সাধনা বা সংস্কৃতি বলতে আমরা কি বুঝি ? ভারতীয় সংস্কৃতির দুটো দিক আছে—একটি হচ্ছে অন্তরের দিক, যোগসাধনা অথবা আধ্যাত্মিক দিক ; অন্যটি হচ্ছে বাহিরের দিক, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক দিক। উভয়ের ভিতর পার্থক্য রয়েছে এবং ভারতের ইতিহাসের নানা পর্যায়ে উভয়ের বিরোধ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে। এমন কি বর্তমানেও সেই বিরোধের সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় নি। এই দ্বন্দ্ব ও বিরোধের কথা পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় তাঁর 'ভারতের সংস্কৃতি' পুস্তকে বলেছেন। তিনি বলেছেন—

"পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাসে দেখি, যেখানে সে গিয়েছে সেখানে স্থানীয় পুরাতন সভ্যতাকে ধ্বংস ও নির্মূল না ক'রে সে তৃপ্ত হয় নি। এই ধ্বংসের ব্যাপার যে শুধু সংস্কৃতিতে অনগ্রসর অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিলণ্ডে ঘটেছে তা নয় ; আমেরিকার সুসভ্য 'মায়া' ও 'আজতেগ' সভ্যতারও উচ্ছেদ না ক'রে সে নিবৃত্ত হয় নি। ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাস অন্যরকমের। এখানে হয়তো সে-রকম ক'রে অন্যদের উচ্ছেদ করা সম্ভবও হয় নি, আর ভারতের ইতিহাস-বিধাতার গূঢ় অভিপ্রায়ও হয়তো অন্যরূপ।

"ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় আর্যদের আসবার পূর্বে আর্যপূর্ব দ্রাবিড় সভ্যতাকে আর্যরা নষ্ট করেন নি। দ্রাবিড়েরাও তৎপূর্ব সব সভ্যতার উচ্ছেদ সাধন করেন নি। এইভাবে বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতির পলিমাটি দিয়ে স্তরে স্তরে ধীরে ধীরে ভারতের সংস্কৃতি-লোকটি গ'ড়ে উঠেছে। পাশাপাশি সবাই বসবাস করেছে। কেউ কাউকেও নির্মূল করে নি। বিধাতা বোধ হয় ভারতে বৈচিত্র্যের মধ্যেই একটি যোগসাধনা চেয়েছেন।...

"অতি উন্নত ও অতি অনুন্নত সাধনা এখানে পাশাপাশি রয়েছে

ব'লে ধর্ম ও সাধনার তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে ভারতের মতো এমন উত্তম বিচারক্ষেত্র আর নেই। এখানে অগ্রসর অনগ্রসর সংস্কৃতির চরম দৃষ্টান্ত একই স্থানে মিলবে। পাশাপাশি নানা সংস্কৃতির যোগাযোগ জীবন্ত থাকাতে এদেশে কতরকম সাধনারই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে এবং সেইজন্যেই এই দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্পদ নানা বিচিত্র ঐশ্বর্যে ভরপুর।

"জ্ঞানালোচনার পক্ষে এরূপ ক্ষেত্রে যতই সুবিধা হোক না কেন, রাষ্ট্রীয় সংহতি ও শক্তির পক্ষে এইরূপ অবস্থা সাংঘাতিক। নৌকাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে রাখলে নৌবিদ্যা শেখাবার পক্ষে হয়তো সুবিধা হতে পারে কিন্তু সেই রকম নৌকায় সাগর পার হতে গেলেই বিপদ। শক্তির মূল কথা সংহতি।...রাষ্ট্রীয় জীবনে কিন্তু সংহতিই বড়ো কথা, ব্যক্তিত্ব সেখানে অনেক সময় বৃথা বাধা মাত্র। অথচ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্যই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। রাষ্ট্রীয় শক্তির মূলে তাই কতক পরিমাণে পশুধর্ম রয়ে গিয়েছে।

"আমাদের দেশে নানা জাতি নানা শ্রেণী নানা ভেদবিভেদ রয়েছে। এগুলি সংস্কৃতির সহায়ক হ'লেও রাষ্ট্রীয় জীবনের পক্ষে মহাসমস্যা হয়েছে। দেশে বিদেশে য়ুরোপীয়রা পূর্ববর্তী সকলকে উচ্ছেদ ক'রেই সেই সমস্যার চমৎকার সমাধান করেছেন। আর বিচিত্রতাযুক্ত আমাদের দেশ এই সমস্যার জন্যই আজ নানাভাবে বিড়ম্বিত ও নিগৃহীত। অথচ এর মূলে ছিল অন্য সকলকে লুপ্ত ক'রে না ফেলবার শুভ ও উদার মনোবৃত্তি।"

যুগে যুগে এই দ্বন্দ্বের, এই সমস্যার মীমাংসা ভারত করতে চেয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা এই মিলনের চেষ্টা, সমন্বয়ের প্রচেষ্টা। বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলনের সেতু তৈরি করা। বিভিন্নতা থাকলেই বা বিদ্বেষবুদ্ধি কেন জাগবে, মতান্তর কেন মনান্তরে পরিণত হবে? সকল সাধনার মধ্যে মৈত্রী, সকল সাধনার মধ্যে সমন্বয়ের সাধনা—যুগে যুগে এই সাধনা ভারত করেছে। সব সময় যে সফল হয়েছে তা নয়। এমন কি এখনও এই সাধনা চলছে। নানা ভেদবিভেদের

মধ্যে যোগস্থাপনার জন্য যুগে যুগে মহাপুরুষ ভারত-সাধক এসেছেন। মহাবীর, বুদ্ধ, কবীর, নানক, দাদূ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি প্রাচীন ও মধ্যযুগের সব সাধক মহাপুরুষ এই কাজই করেছেন। ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজ এই কাজ করেছেন ও ভবিষ্যতে করবেন। যতদিন এই যোগস্থাপনের প্রয়োজন আছে ততদিন, আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি যে, ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজের প্রয়োজন আছে। বাহিরের দিক থেকে বৈচিত্র্য ও অন্তরের দিক থেকে যোগসাধন—ব্রাহ্মসমাজের এই প্রচেষ্টা ভারতীয় সংস্কৃতির অনুকূল ও বর্তমান পরিস্থিতিতে এই প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। আজ সবাই খুঁজছে শান্তি; সবাই চাইছে আপন আপন বিশেষত্ব বজায় রেখেও সাম্প্রতিক অপরিসর মিলনের ক্ষেত্র বড়ো করতে। এ মিলন-ক্ষেত্র শুধু highest common factor কিংবা greatest common multiple-এর উপর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা নয়—এ হচ্ছে অন্তরের দিক থেকে যোগসাধনের চেষ্টা। কারণ, অন্তরের যোগ না থাকলে বাইরের বৈচিত্র্য আমাদের শুধু বিড়ম্বিত করবে। ভারতের বৈদেশিক নীতির মূলকথা "পঞ্চশীল" এই মিলন-প্রচেষ্টার নামান্তর মাত্র।

বর্তমান যুগে এই প্রচেষ্টা বিশেষ ক'রে সাধন করেছিলেন ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজ। যে সময়ে ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে সময়ের ইতিহাস আলোচনা করলে প্রথমেই দেখা যায় যে, প্রচলিত হিন্দু ধর্ম ও সমাজ বৈচিত্র্যকে ভেদের গণ্ডীতে আবদ্ধ করেছিলেন নানা ভাবে—জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি নানাবিধ প্রাচীর সৃষ্টি ক'রে। অন্তরের দিক থেকে যোগসাধনা দাঁড়িয়েছিল আচার ও সংস্কারের নিরর্থক ব্যবহারে ও আচরণে। যে সময়ের কথা স্মরণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা করেছিলেন—

যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি',
... ...

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি',
পৌরুষেরে করে নি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

সেই তুচ্ছ আচারের কথা স্মরণ ক'রেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "যে ধর্ম চালের হাঁড়ির ভেতর আবদ্ধ, সে ধর্ম ভারতের ধর্ম নয়।" যে প্রার্থনা রবীন্দ্রনাথ ১৩০৮ সালে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত করেছিলেন সেই প্রার্থনা সার্থক করতে চেয়েছিলেন ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজ ১৩০৮ সালের বহু পূর্ব থেকে। সেই প্রার্থনা আজও সম্পূর্ণ সফল হয় নি। আজও তার সার্থকতা আমাদের আহ্বান করছে। হয়তো ব্রাহ্মসমাজেও আচারের সংকীর্ণতা ও অন্তরের দীনতা এসেছে, তাই সেই প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তার আজও শেষ হয় নি।

ব্রাহ্ম ধর্মের ও সমাজের প্রথম অভ্যুদয়ের যুগে যে প্রার্থনা, যে সমন্বয়ের আদর্শ ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজ সফল করতে চেয়েছিলেন, সে আদর্শের কথা স্মরণ করলেই ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজের তদানীন্তন কয়েকটি বিশেষত্বের কথা মনে পড়ে। প্রথমেই মনে পড়ে যে, ভারতীয় সংস্কৃতির মূলগত আদর্শের অনুকূল হ'লেও ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজ সে আদর্শকে আধুনিকতার জ্ঞানদৃপ্ত মহিমায় ও সার্বজনীনতার শোভায় (Modernism ও Universalism) মণ্ডিত করতে চেয়েছিলেন। তাই ভারতের নবজাগরণের (Renaissance) নব নব অভ্যুদয় ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজের ভিতর দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছিল। Modern content অথবা নবযুগের সাধনা শুধু যে বিচারবুদ্ধির (Rationalism) উপর প্রতিষ্ঠিত তা নয়। নবযুগের সাধনায় ছিল একাধারে নূতন জ্ঞানবিজ্ঞানের আলো, নূতন সাহিত্যসৃষ্টি, নূতন সামাজিক হিতকর কর্মপ্রচেষ্টা ও তত্ত্বজিজ্ঞাসা—শুধু যে নূতন ক'রে ভারতের আদর্শকে পুনরুদ্ধার করা তা নয়, সেই আদর্শকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও কর্মযোগের সাথে মিলিয়ে

দেওয়া। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ এই তিনের সম্মিলন ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজের ভিত্তি গ'ড়ে তুলেছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহনের বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ ব্রহ্মযোগ ও কেশবচন্দ্রের বিশুদ্ধ ব্রহ্মভক্তি—এই ত্রিবেণীসংগমে তদানীন্তন ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজের প্রতিষ্ঠা। সেই প্রতিষ্ঠা যে শুধু ব্যক্তিগত জীবনে ও সাধনায় তাঁরা চেয়েছিলেন তা নয়, তাঁরা চেয়েছিলেন দেশে ও সমাজে সেই প্রতিষ্ঠার আবির্ভাব হোক ও সমগ্র জগতে তার প্রভাব বিস্তারিত হোক।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের Universalism ব্রাহ্মসমাজের আদিযুগের বিশেষ স্মরণীয় দান। স্বনামধন্য সমাজসেবক, দার্শনিক ও জ্ঞানী Albert Schweitzer মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে বলেছেন, "He was the great pioneer of Modern Indian thought. His knowledge of the religions of the world was remarkable, as also his linguistic abilities, for he knew Bengali, Sanskrit, Persian, Arabic, English, Greek and Hebrew."

ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজকে সার্বজনীন রূপ দেবার প্রচেষ্টা মহাত্মা রাজা রামমোহন ও পরে বিশেষরূপে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র করেছিলেন। সুসাহিত্যিক স্বর্গীয় মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের ভাষায় বলি, "কেশব যুক্তিবাদী নহেন, ভক্তিবাদী। কেশব যে শক্তিবলে যুগসংকট উত্তীর্ণ হইতে চাহিলেন সে শক্তি আত্মিক বিশ্বাসের শক্তি। তাই কেশব রামমোহনের মতো নীতিবাদী নহেন—নীতিধর্মী; তিনি ধর্মপ্রণেতা নহেন—ধর্মপ্রচারক। তথাপি কেশব ও রামমোহনের লক্ষ্য এক।...জাতীয় জীবনযজ্ঞে প্রথম অগ্ন্যাধান করিয়াছিলেন কেশব। তাঁহার প্রচারকর্মের অপূর্ব উন্মাদনা, নূতন ভাব চিন্তাকে বাহিরের আচার-অনুষ্ঠানে রূপ দিবার আশ্চর্য সৃজনীশক্তি এবং সর্বোপরি তাঁহার ব্যক্তিত্ব বিরোধী সম্প্রদায়কেও অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এক ধর্ম, এক জাতি, এক ভগবান্ এই মহাবাক্য প্রচার-কল্পে যে বাঙালী কবি মহাকাব্য রচনা করিতে

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সেই কবি নবীনচন্দ্র কেশবের বাণী হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। কেশবের অব্যবহিত পরবর্তী কালে যে আর এক মহাপুরুষ এই জাতির জীবনযজ্ঞে আহুতি দিয়াছিলেন সেই বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহার প্রচার-প্রণালী ও কর্মপদ্ধতিতে কেশবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। যে অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষা কেশব তাঁহার জীবনবেদে উল্লেখ করিয়াছেন, ভাবের সেই উৎসাহ কর্মোন্মাদনার সেই উত্তাপ বিবেকানন্দের জীবনেও অপরিমিত।"

তাই যখন বলা হয় যে ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজ ঔপনিষদিক বেদান্ত-দর্শনের পরিধি-বেষ্টিত, কিংবা শুধু Rationalism-এর উপর প্রতিষ্ঠিত, কিংবা শুধু social reform-এই পর্যবসিত ও সমাপ্ত, তখন আমার মন তাতে সায় দেয় না। স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়-সম্পাদিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী গ্রন্থের "দেবেন্দ্রনাথ, বেদান্ত ও ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থ" নামক পরিশিষ্টে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা আছে। সময়াভাবে সে আলোচনা আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করব না। শুধু মহর্ষি নিজে কি বলেছেন তাঁর ১৮৬৪ সালের রচনা "ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্তে", তাই আপনাদের কাছে উল্লেখ করছি। তিনি বলেছেন, "রামমোহন রায়ের মনের ভাব কিসে সকল প্রকার পৌত্তলিকতা গিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়। এইজন্য একদিক হইতে যেমন ভারতবর্ষের লোকদিগের বেদান্তপ্রতিপাদ্য একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিলেন, তেমনি আবার পৃথিবীর সমুদায় লোককে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত করিবার জন্য আর দিক হইতে তিনি কি করিলেন? না, বাইবেলকে নিয়ামক বলিয়া তাহাতে যে পৌত্তলিক ভাগ আছে তাহা পরিত্যাগ পূর্বক বাইবেল দ্বারাই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা সিদ্ধান্ত করিলেন। সেই প্রকার কোরানকে নিয়ন্তা করিয়া কোরান দ্বারাই এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিপন্ন করিলেন। ইহাতে হিন্দু

মুসলমান খৃষ্টান সকলের সহিত তাঁহার বিবাদ হইল।...যে ধর্ম সহজজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে সে ধর্ম হইতে যে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি নিবদ্ধ হওয়া ও কার্যেতে তাহা পরিণত হওয়া, ইহা পৃথিবীর কোনো পুরাবৃত্তে নাই।" মহর্ষির উপরোক্ত কথা ব্রাহ্মসমাজের সার্বজনীনতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও স্মরণ করিয়ে দেয় সে আদর্শ হতে আমরা কতটা বিচ্যুত হয়েছি। ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজের সূচনা ও প্রচেষ্টা শুধু negative protest ও social reform-এই শেষ হয়ে যায় নি, একথা যথেষ্ট প্রমাণিত হয় ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজের প্রথম ৭৫ বৎসরের ইতিহাসে। আক্ষেপের বিষয়, সে ইতিহাস এখনও ভালো ক'রে লেখা হয় নি—বিশেষ ক'রে বাংলা ভাষায়।

ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজের প্রথম যুগের আদর্শ ও সাধনার কথা যা আমি আপনাদের কাছে বলেছি তাতে বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে: প্রথম, ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে মিল রেখে বৈচিত্র্যের মধ্যে তত্ত্বপরায়ণতা ও ব্রহ্মোপাসনার মাধ্যমে আন্তরিক যোগসাধনের চেষ্টা; দ্বিতীয়, সামাজিক সংহতি গঠনের জন্য বিধি নিষেধের ভেদাভেদ দূর ক'রে এক বলশালী ও গরিষ্ঠ সমাজ গঠন করা; তৃতীয়, এই মিলন অথবা সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত করা Modernism ও Universalism এর বৃহত্তর ক্ষেত্রে।

কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে, এ ধরণের মিলনের প্রচেষ্টা অন্য কোনো ধর্মে কখনও হয় নি। যুগধর্ম সবাইকে অল্পবিস্তর মেনে চলতে হয়। কোনো ধর্মই একেবারে স্থিতিশীল ও অচল হতে পারে না। নূতন জ্ঞানবিজ্ঞানের সাথে প্রচলিত ধর্মের একটা আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা সর্বত্রই হয়েছে ও এখনও চলছে। কিন্তু প্রধানত এই চেষ্টা হয়েছে নিজের ধর্মের বিশেষত্ব ও প্রাধান্য মেনে নিয়ে ও অন্য-ধর্মাবলম্বী লোকদের নিজের ধর্মে আকৃষ্ট করবার প্রযত্নে—যার পরিচয় খৃষ্টান ধর্ম অথবা মুসলমান ধর্মের বিস্তৃতির ইতিহাসে প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যাবে। হিন্দুধর্মের

সর্বগ্রাসী উদারতা অনেকটা অন্যধরণের। অন্য ধর্মের বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ ক'রে হিন্দুধর্ম নিজের প্রসারতা ক্রমশ বাড়িয়েছে—তার পরিচয় ভারতের ইতিহাসে বিরল নয়। কিন্তু তবুও আমার মনে হয় যে, যে যুগে ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজের আবির্ভাব সে যুগে ব্রাহ্ম সমাজ ও ধর্ম বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ও ভেদরহিত সামাজিক সংহতির প্রচেষ্টায়, জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের সম্মিলনে এবং ধর্মের সার্বজনীনতায় অগ্রদূতের কাজ করেছেন। আমার আন্তরিক বিশ্বাস যে, সে কাজের এখনও প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ ক'রে যে ভাবে ব্রাহ্মসমাজ সর্বধর্ম-সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন, তা অপূর্ব ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

এই সমন্বয়ের প্রয়াসকে অনেকে Christian outlook ব'লে অভিযুক্ত করেছেন। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বর্গীয় অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্তের নিকট পুরাতন কাহিনী বলতে গিয়ে বলেছেন, "ফুলকে ডালসুদ্ধ গাছ হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া কাচের ফুলদানির মধ্যে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিলে তাহার যে অবস্থা হয়, আমাদের গত শতাব্দীর বাংলার Reform Movement-এর সেই অবস্থা হইয়াছে। রামমোহন রায়ের সময় কিন্তু কেহ কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, এ রকমটা দাঁড়াইবে। সমাজের ভিতর হইতে সমাজকে সংস্কার না করিলে কিছুতেই সফলপ্রযত্ন হওয়া যাইবে না, ইহা তিনি বেশ বুঝিতেন। তাই তিনি অনেকটা সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পরে কেশবচন্দ্র সেন সমস্ত Reform Movement-টাকে এমন একটা twist, এমন একটা মোচড় দিলেন যে, সব গোলমাল হইয়া গেল। কেশবচন্দ্র উপনিষদের কোনো ধার ধারিতেন না; ভারতবর্ষের প্রাচীন culture -এর ভিতরকার কথা ভালো করিয়া জানা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না, যতটুকু বুঝিতে পারিলেন, সেটুকুকেও পাশ্চাত্য পরিচ্ছদে মণ্ডিত না করিলে তিনি লজ্জিত বোধ করিলেন। নূতন সমাজ গঠিত করিয়া বিলাতি ছাঁচে তাহার নাম দিলেন New Dispensation—নব-বিধান। এই যে কেশবচন্দ্র বিদেশের দিকে মুখ

ফিরাইলেন, একটা উৎকট বিলাতি attitude লইলেন,—এইখানেই সমস্ত Reform Movement-টা পণ্ড হইবার আয়োজন হইল।"

এ অভিযোগের উত্তর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। তাঁরই ভাষায় বলি, "কেশবচন্দ্রের কর্মজীবনের যখন উজ্জ্বল উদীয়মান অবস্থা, তখন আমার বয়স অল্প ছিল। সে সময়ে কেশবচন্দ্র যখন বিদেশী সাধু ঈশার জীবনের কথা বিবৃত করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগ, ভক্তি ও দেশে তাঁহার ধর্ম ও ধর্মজীবনের গুরুত্ব ও বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তখন আমার মনে সহজেই এই ভাবের উদয় হইল, বিদেশী সাধুজীবনের গৌরব ভারতে প্রচার করিতে যাইয়া ভারতের সাধু মহাজনদিগের গৌরবের হানি করিতেছেন। শেষে আমার পরবর্তী জীবনে কেশব-জীবনে শিক্ষা সাধনা ও সিদ্ধিলাভের আলোচনা করিতে যাইয়া আমি পূর্ব সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। ...পরবর্তী সময়ে আমি কেশবের জীবনের সাধনার বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া দেখিলাম ঋষিগণ যে ভাবে সকল ভুবনে ঈশ্বরের আবির্ভাব, ঈশ্বরের প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছেন, কেশব সেই ভাবের প্রকাশ উপলব্ধি করিতে যাইয়া স্বদেশী বিদেশী সকল সাধুমহাজনদিগের জীবনে তাঁহার প্রকাশ ও বিশেষ লীলা প্রত্যক্ষ করিলেন।...এইরূপে স্বদেশের বিদেশের সকলকে গ্রহণ করিতে যাইয়া, তিনি ধর্মের ও ধর্ম-সাধনের এক উচ্চতর, প্রশস্ততর স্তরে সার্বভৌমিক স্তরে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার জীবনের ও সাধনের বিশেষত্ব বুঝিলাম, স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম।"

এখানে ব্রাহ্মধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বললে হয়তো অবান্তর হবে না। খৃষ্টীয় ধর্ম ও মহম্মদীয় ধর্ম য়িহুদী ধর্ম থেকে উদ্ভূত। মতগত rigidity উভয় ধর্মেই প্রবল। হিন্দুধর্মে মতের উদারতা আছে, কিন্তু তার সাথে আছে আনুষ্ঠানিক নিষ্ঠা। এই বিষয়ে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, "যে কপিল নাস্তিকতার পোষণ করিয়া অভ্যুদিত হইলেন, বেদের ও শাস্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন, হিন্দুগণ সেই কপিলকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যে শাক্যসিংহ

দেব, দ্বিজ, বেদ, শাস্ত্র প্রভৃতির ঘোর বিদ্বেষী হইয়া দাঁড়াইলেন, তিনিই কালে হিন্দুর হৃদয়াসনে অবতাররূপে স্থানপ্রাপ্ত হইলেন।…প্রচলিত হিন্দুধর্মের ভাব এই : তোমার মত কি, তুমি সকল কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মান কিনা, তাহার সহিত সমাজের বিশেষ সম্বন্ধ নাই ; ধর্মের প্রচলিত অনুষ্ঠানগুলি তুমি যতক্ষণ করিতেছ,…ততক্ষণ তুমি হিন্দু। অনুষ্ঠানের উপরে অতিরিক্ত মাত্রায় এতটা ঝোঁক দেওয়াতে অনিষ্টফল এই হয় যে, ধর্মের প্রধান অঙ্গ যে নীতি তাহার প্রতি লোকের ঔদাসীন্যবুদ্ধি জন্মে।"

ব্রাহ্ম সমাজ ও ধর্মে নীতির প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে—কিন্তু ঈশ্বর-নিরপেক্ষ নীতি নয়। বৌদ্ধধর্মের ethical value-র আজকাল অনেকেই প্রশংসা করেন—বিশেষ ক'রে বৌদ্ধধর্মের rules of conduct, যাকে eightfold path বলা হয়েছে—right knowledge, right feeling, right speech, right action, right living, right effort, right insight and right meditation.

কিন্তু বুদ্ধদেব নীতিকে ঈশ্বর-প্রীতির উপর স্থাপিত করেন নাই। আমরা যেমন বলি, প্রীতিঃ পরমসাধনম্, কিংবা তস্মিন্ প্রীতিঃ তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব, বৌদ্ধধর্মে নীতিকে ঠিক সেইভাবে উপস্থাপিত করা হয় নাই। Albert Schweitzer বৌদ্ধধর্মের নীতিবাদ সম্বন্ধে বলেছেন —

"According to the Buddha, we must not only realise that this life on earth is full of sorrow but also that this existence is our lot, because, under the delusion that it can bring us pleasure, we cherish desire for it. It is the meaningless will-to-live—Buddha calls it the desire for existence and pleasure—that leads living beings from reincarnation to re-incarnation. The end of suffering can only be brought about by men killing in themselves the will-to-live."

যদিও একথা ঠিক যে বুদ্ধদেব নীতিবাদ ঈশ্বর-প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, Schweitzer যে ভাবে বৌদ্ধ নীতিবাদ ব্যাখ্যা করেছেন তাতেও কিছুটা অতিশয়োক্তির ত্রুটি রয়েছে। কারণ বুদ্ধদেব সাধু-সিংহের কাছে তাঁর উপদেশে বলেছেন—

"It is true Sinha that I denounce activities, but only the activities that lead to evil in words, thought or deeds. It is true Sinha, that I preach extinction but only the extinction of pride, lust, evil thought and ignorance, not that of forgiveness, love, charity or truth."

এই বিষয়ে ব্রাহ্মধর্মের নীতিবাদ কিছুটা স্বতন্ত্র-ভাবাপন্ন। ব্রাহ্ম-ধর্মের নীতিবাদ শুধু সামাজিক নিয়মাবলীর বিবর্তন নয়, কিংবা will-to-liveএর ছেদন নয়। প্রাণগত ধর্ম ও নীতিবাদ সম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী যা বলেছেন তা আজও আমাদের হৃদয়কে দোলা দেয়। তিনি বলেছেন, "ধর্ম কখন প্রাণে আসে? উত্তর : যখন হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রীতি জাগিয়া উঠে ও অনলের ন্যায় হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া পরিবর্তিত করিতে থাকে। ধর্ম কখন প্রাণে আসে? উত্তর : যখন ধর্ম লক্ষ্য ও বিষয় উপলক্ষ্য হয়। ধর্ম কখন প্রাণে আসে? উত্তর : যখন চিন্তা ভাব ও আকাঙ্ক্ষা ঘনীভূত আকারে ধর্মের দিকে ধাবিত হয়। ধর্ম কখন প্রাণে আসে? উত্তর : যখন পাপে অরুচি ও পুণ্যে রুচি জাগ্রত হইয়া হৃদয়ে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করে।…হৃদয়-পরিবর্তন চাই।…যে জিনিসে মত, অনুষ্ঠান ও নীতি সকলকে সামলায়, সেই জিনিস চাই। তাহাই প্রকৃত ধর্মজীবন।"

তাই ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজ শুধু মতবাদ, শুধু আনুষ্ঠানিক নিষ্ঠা, শুধু নীতিবাদের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন নি। বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি ব্রাহ্মসমাজ অস্বীকার করেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, "স্বার্থনাশন্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে"।

ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ

এতক্ষণ ব্রাহ্ম সমাজ ও ধর্মের আদর্শের কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করেছি এই ভেবে যে, সে আদর্শকে স্মরণ করবার ও পুনরায় আমাদের মধ্যে জাগ্রত করবার সময় এসেছে। আমরা সে আদর্শ থেকে কতটা স'রে গিয়েছি, বর্তমান যুগধর্মের প্রভাবে সে আদর্শে কি পরিবর্তন দরকার, সে কথা ভাববার সময় এসেছে যদি ব্রাহ্মসমাজ হিসেবে আমাদের বেঁচে থাকতে হয়। এবার তাই আমাদের অধোগতির কথা, ত্রুটিবিচ্যুতির কথা শান্তসমাহিত চিত্তে ভেবে দেখা উচিত।

প্রথমেই যে প্রশ্ন মনে জাগে, তা হচ্ছে—ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ। এখানে ধর্ম ও সমাজের ভিতর যে প্রভেদ রয়েছে তার উল্লেখ করা দরকার। সমাজের উত্থান ও পতন রয়েছে নানা ভৌগোলিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কারণে। কিন্তু ধর্মের ভিতর যে সত্য নিহিত থাকে তাকে আমরা বলি সত্যং শাশ্বতমনশ্বরম্। তাই বলা হয়েছে, ধর্মের জীবন নাই মরণ নাই, ইহার আদি নাই, ইহার অন্ত নাই। ধর্মই মানব-মনের অমর অংশ। ব্রাহ্মধর্মের ভিতর যে সত্য রয়েছে সে সত্যের বিনাশ হবে, কালক্রমে তা লুপ্ত হয়ে যাবে, এ সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের ব্যতিব্যস্ত হবার বিশেষ কোনো কারণ আমি দেখি না। বৌদ্ধধর্মও এদেশ থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাই ব'লে একথা কেউ বলবেন না যে, বৌদ্ধধর্মের মৌলিক মতের কোনো প্রয়োজনীয়তা কিংবা অস্তিত্ব আজ আর নেই। সে ধর্ম আজও প্রভাব বিস্তার করছে নানা দেশ ও জাতির উপর। বরঞ্চ বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে নূতন ক'রে আগ্রহ ও শ্রদ্ধা আমাদের দেশে জেগেছে—যে দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল। তাই ব্রাহ্মধর্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো দুশ্চিন্তা আমার নেই। যে সত্যের উপর ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠিত সে সত্যের বিকাশ নানা যুগে, নানা দেশে, নানা ভাবে হতে থাকবে, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণরূপে আস্থাবান্। ব্রাহ্মসমাজ নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে পারে, ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ অন্যে গ্রহণ করতে পারে, এ তো আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে। চিন্তার বিষয় ব্রাহ্মসমাজের, ব্রাহ্মধর্মের নয়।

ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনটি প্রশ্ন আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করতে চাই। আপনাদের অনেকের মনেই হয়তো এ প্রশ্ন জেগেছে, ও তার উত্তরও হয়তো আপনারা ভেবে রেখেছেন। প্রথম প্রশ্ন : ব্রাহ্মসমাজের কাজ কি শেষ হয়ে গেছে? জীবজগতে যে ভাবে নির্দিষ্ট কাজ শেষ হয়ে গেলে functional organ-এর ক্রমশ লোপের সম্ভাবনা থাকে, সেই নিয়মে ব্রাহ্মসমাজ ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যাবে ও যাচ্ছে এ কথা ঠিক কিনা। দ্বিতীয় প্রশ্ন : উৎসাহ উদ্যম ও সত্যিকার ধর্মজীবনের অভাবে ব্রাহ্মসমাজের তথা অন্য অন্য ধর্মসমাজেরও অধোগতি অবশ্যম্ভাবী কিনা। তৃতীয়ত : ব্রাহ্মসমাজ মধ্যবিত্ত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের গণ্ডী অতিক্রম করতে কখনও সমর্থ হবে কিনা। যদি সে গণ্ডী অতিক্রম করতে সমর্থ না হয়, তাহলে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সংকোচনের সাথে সাথে ব্রাহ্মসমাজের সংকোচনও অবশ্যম্ভাবী। প্রথম প্রশ্নটি ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব প্রশ্ন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্ন ব্রাহ্মসমাজের তথা অন্যান্য ধর্মসমাজের প্রশ্ন।

সভ্যতার উত্থান ও পতন সম্বন্ধে বর্তমান যুগে যে তিনজন চিন্তাশীল লেখক আলোচনা করেছেন—রুশদেশীয় Nikolai Danilevsky, জর্মানদেশীয় Oswold Spengler, ও ইংরেজ ঐতিহাসিক Arnold Toynbee—তাঁদের মধ্যে আমি Spengler ও Toynbee-র মতামতের কিছুটা উল্লেখ করব।

স্পেঙ্গ্‌লার-এর মতে, অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক সভ্যতা ও সমাজের জন্ম, অভিব্যক্তি, অধোগতি ও মৃত্যু ঘটে, যাকে স্পেঙ্গ্‌লার Morphology of Cultures বলেছেন। যে নিয়মানুসারে এ অভ্যুদয় ও পতন হয় তা অপরিবর্তনীয় ও অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সমাজের যে অবস্থা হয়, তার বর্ণনা ক'রে স্পেঙ্গ্‌লার বলেছেন, "In the last phase of civilisation the creative spirit has disappeared, the civilisation has reached its finished form. No new great creations appear either in art, or in religion or in politics. Life

has become intellectualised and commercialised and although science may flourish and there may be much talk and time and money spent on art or religion, it has lost its creative drive. The forms have ultimately been established, many changes, variations and mixtures between them may still appear, but no fundamentally new forms appear any more. All great problems have been solved ; the struggles that go on are no longer, as in the "Culture" phase, about ideas, but purely for power."

উপরোক্ত যে লক্ষণসমূহের কথা স্পেঙ্গ্লার বলেছেন, যা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে দেখা দেয়, তা আমাদের প্রণিধানযোগ্য, বিশেষ ক'রে এই জন্য যে, সে লক্ষণসমূহের কয়েকটি লক্ষণ আমাদের সমাজে দেখা দিয়েছে। এ কথা ঠিক যে আমাদের সমাজে এখন (১) নূতন creation অথবা creative spirit-এর অভাব এবং (২) বিচারবুদ্ধি (intellectualism) বিবেক, অনুভূতি ও ধর্মোপলব্ধিকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, এবং আমাদের জীবনযাত্রা শুধু অর্থনীতি ও বিচারের শুষ্ক পথেই চলেছে—য়াকে কবি বলেছেন, "The world is too much with us".

ধর্মানুভূতির কথা, ধর্মোপলব্ধির কথা আজকাল উপহাসের কথা—যাকে বলা হয়েছে কাল্পনিক, তর্কশাস্ত্রের মাপকাঠিতে যা মাপা যায় না, যেমন বহু পূর্বে বলা হয়েছিল এই দেশেই, "ঈশ্বরাসিদ্ধঃ প্রমাণাভাবাৎ"। একটা কথা আমরা ভুলে যাই যে নূতন সৃষ্টির মূল কথা inspiration, অনুভূতি বা উপলব্ধি। সৃষ্টি আগে, বিচার পরে। বিচার আসে পরে যা সত্যকে বুঝিয়ে দিতে সহায়তা করে, মূল সত্যকে আবিষ্কার করতে নয়। আজকাল ব্রাহ্মসমাজে Rationalism-এর প্রবল প্রভাব—যাকে স্পেঙ্গ্লার শেষ দশার একটি নিদর্শন হিসেবে ধরেছেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, বিচারবুদ্ধির সাথে বিবেকবুদ্ধির যোগ হতে পারে, inspiration-এর সাথে reason-এর সপত্নীসম্বন্ধ না-ও হতে পারে।

যদি স্পেঙ্গ্লার-এর কথাই সত্য হয়, তাহলে ব্রাহ্মসমাজ মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে, কোনো উপায়েই সমাজকে রক্ষা করা চলে না।

স্বভাবতই, স্পেঙ্গ্লার-এর মতে আমার মন সায় দেয় না। পক্ষান্তরে সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবী বলেছেন, স্পেঙ্গ্লার-ব্যাখ্যাত নিয়মানুসারে সভ্যতা কিংবা সমাজের উত্থানপতন ঘটে না। সমাজের ও সভ্যতার উত্থান ও পতন নির্ভর করে challenge ও response-এর উপর। টয়েনবী বলেছেন, "In the course of its development a society is repeatedly faced by challenges to its well-being and even to its very existence. It response to that challenge determines its future, if the response is adequate to meet the challenge, the life of that society will continue enhanced by the internal and external force deriving from its success. If the challenge is not successfully met, the society loses in intrinsic value or external prestige or in material and spiritual welfare, perhaps even to such an extent as to constitute virtually the end of that particular society." এইটাই সমাজের "পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা"—যাকে টয়েনবী সভ্যতার "Rhythmic view" ব'লে ব্যাখ্যা করেছেন।

আমি টয়েনবী-র মতে বিশ্বাসী। আমার ধারণা, ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ সেই পরিমাণে আমাদের উপর নির্ভর করছে, যেই পরিমাণে আমরা বর্তমান যুগের challenge-এর সম্মুখীন হতে পারব, নিজেদের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তায় ও নব নব কর্মপ্রচেষ্টায়। যদি বর্তমান ও ভবিষ্যতের দাবী আমরা পূরণ করতে পারি তবে আমরা বাঁচব, যদি তা পূরণ করতে না পারি তাহলে ব্রাহ্মসমাজ পৃথক্ সমাজ হিসেবে হয়তো থাকবে না, যদিও ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্য অন্য সমাজকে অনুপ্রাণিত ক'রে তাকে বলশালী করবে।

ছেলেবেলায় স্বর্গত শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের লেখা একটি

ছোটো পুস্তিকা পড়েছিলাম, পুস্তিকাটির নাম "Will the Brahmo Samaj last ?" সম্প্রতি পুস্তিকাটি খুঁজে পাই নি। যতদূর স্মরণ আছে, বৌদ্ধ ধর্মের ও সমাজের ভারতে তিরোধান absorption ও attrition দ্বারা সাধিত হয়েছিল বিচারমূলক পদ্ধতিতে তিনি তা বলেছিলেন। আরো বলেছিলেন, সে রকম তিরোধানের সম্ভাবনা ব্রাহ্মসমাজের নেই। কিন্তু আমার মনে হয় যে, আমরা যদি আমাদের সমাজকে প্রাণবন্ত ক'রে না রাখি, তাহলে সে সম্ভাবনা যে রয়েছে আজ আর তা অস্বীকার করা চলে না।

প্রথম প্রশ্ন, আমাদের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে কিনা। যে আদর্শের কথা আমি পূর্বে বলেছি, সে আদর্শের প্রতি দৃষ্টি দিলে একথা স্বীকার করতেই হবে ব্রাহ্মসমাজের কাজ এখনও শেষ হয় নি। অনেক দূরের পথ এখনও চলবার বাকি আছে।

ব্রাহ্মসমাজের বাইরের দিক যেটা—social reform ইত্যাদি—তা অন্য সমাজ গ্রহণ করেছেন, কতকটা ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে ও কতকটা যুগধর্মের সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য। কিন্তু আগেই বলেছি, ব্রাহ্মসমাজের অন্তরের দিকও রয়েছে—শুধু মতবাদে নয়, অনুষ্ঠানে নয়, পরন্তু ধর্মনীতিতে ও ধর্মপ্রাণে। সে অন্তরের দিক যেমন ক'রে আগে ফুটে উঠেছিল ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজে, সেই অন্তর্লোক যদি আমরা আবার জাগিয়ে তুলতে পারি এই প্রগতিশীল জগতে, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি, কিন্তু সে পথের পরিচয়ের আজও প্রয়োজন রয়েছে—শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাহিরেও। শুধু মতবাদের দিক দিয়ে দেখতে গেলেও সনাতন সমাজের সহিত আমাদের এখনও পার্থক্য রয়েছে। সাকার উপাসনা, মধ্যবর্তিবাদ, অবতারবাদ ইত্যাদির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। এসব মতভেদের মধ্যে কোন্ মতটি সত্য সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। বিভিন্নতা রয়েছে, কাজ এখনও শেষ হয় নি, সেই কথাটিই আমার এখানে বলবার বিষয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের আভাস আগেই আমি দিয়েছি। আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের উপরই নির্ভর করছে। আমাদের ঔদাসীন্য, আমাদের

ত্রুটিবিচ্যুতি কোনো অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃতিক নিয়মে সংঘটিত হচ্ছে না। ঔদাসীন্য দূর করবার ক্ষমতাও আমাদের রয়েছে। এইখানে একটি কথা যা আমার মনে এসেছে, আপনাদের কাছে বলছি। খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্মে রয়েছে মতবাদের বাধানিষেধ, প্রচলিত হিন্দুধর্মে মতের উদারতার সঙ্গে রয়েছে অনুষ্ঠানের প্রতি নিষ্ঠা; কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজে না রয়েছে মতের বাধানিষেধ, না রয়েছে অনুষ্ঠানের প্রতি নিষ্ঠা, এমন কি ধর্মনীতি ও ধর্মপ্রাণের প্রতিও আমরা শ্রদ্ধা হারিয়েছি। বর্তমানে ব্রাহ্মসমাজ দাঁড়িয়েছে সুবিধাবাদের উপর—a religion and society of convenience or expediency। যা সুবিধাজনক তাই করা যায়, সামাজিক কোনো জোর নেই, কোনো জবরদস্তি নেই, বিশ্বাসের কোনো পটভূমি নেই, কোনো বালাই নেই—অবস্থাটা অনেকটা এই রকমের। এ অবস্থা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর এবং সমাজের পক্ষে হিতকর অবস্থা নয় ব'লেই আমি মনে করি। এই অবস্থায় ঔদাসীন্য অবশ্যম্ভাবী। ঔদাসীন্য স্থিতিশীলতার পরিচায়ক, নব নব সৃষ্টির কিংবা কর্মপ্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা ঔদাসীন্য থেকে কখনও আসে না। ঔদাসীন্য, সুবিধাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বচ্ছন্দ জীবন, মৃত্যুর পূর্বাবস্থাই ঘোষণা করে। প্রগতির মূল স্রোতোধারায় ব্রাহ্মসমাজকে ভাসতে হবে, নইলে পিছনে প'ড়ে থাকার লাঞ্ছনা পদে পদে ভোগ করতে হবে।

মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সমাজের বাইরে ব্রাহ্মসমাজ কতটা যেতে পারবে—এ প্রশ্নের কোনো সহজ উত্তর আমি খুঁজে পাই নি। মধ্যবিত্ত সমাজকে 'বুর্জোয়া' সমাজ নামে অভিহিত ক'রে সব দোষ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া প্রচলিত মতবাদের একটি fashionable অথবা চলতি মত। এমন কথাও অনেক ব্রাহ্ম যুবকের মুখে শুনেছি যে, ব্রাহ্মসমাজ মার্ক্সীয় মতবাদ স্বীকার ক'রে না নিলে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারবে না। সমাজ-ব্যবস্থায় কি ধরণের অর্থনৈতিক পরিবর্তন আবশ্যক, সে সম্বন্ধে নানা মতবাদ নানা সময়ে গৃহীত হয়েছে। এই সব পরিবর্তনশীল মতবাদের উপর কোনো ধর্মই সাক্ষাৎ ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বেশি দিনের কথা নয় যখন

Marshall প্রমুখ Classical অর্থনীতিবিদ্‌দের মত অর্থনৈতিক জগতে সত্য ব'লে মেনে নেওয়া হ'ত। পরে যখন Keynesian মতবাদ উপরোক্ত মতের ভ্রমপ্রমাদ প্রমাণিত করল, তখন অনেকেই নূতন মত মেনে নিলেন। সমাজ-ব্যবস্থায় কি পরিবর্তন আবশ্যক তা বহুল অংশে সাময়িক। যা অসাময়িক অথবা মৌলিক তা হচ্ছে সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ। যে পরিবর্তন কল্যাণপ্রসূ, যে পথ মঙ্গলের পথ—ব্রাহ্মসমাজ তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকবেন এই আশাই আমি পোষণ করি।

মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে নূতন ধর্মের, নূতন সমাজের সৃষ্টি হয়েছে—এটা ইতিহাসে নূতন কথা নয়। বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা তদানীন্তন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, কিন্তু তবুও জনসাধারণের ভিতরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে কোনো দুরতিক্রম্য বাধা উপস্থিত হয় নি। ব্রাহ্ম সমাজ ও ধর্মের appeal প্রধানত intellectual, emotional নয়; ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানাদি অনাড়ম্বর ও স্বল্পসংখ্যক—এই সব কারণে ব্রাহ্মসমাজ সাধারণে প্রসারিত হতে পারে না, এসব কথা আমরা শুনেছি এবং হয়তো এসব মন্তব্যের মধ্যে আংশিক সত্য রয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের থেকেও স্বল্পসংখ্যক ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানাদি থাকা সত্ত্বেও ইসলাম ধর্ম ও সমাজ যদি সাধারণে প্রসারিত হতে পারে, তাহলে ব্রাহ্মসমাজের সে রকম প্রচারের পথে কেন যে দুরতিক্রম্য বাধা থাকবে তা বোঝা কঠিন। নানা অর্থনৈতিক কারণে সমাজে শ্রেণীবিভাগের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। যাদের ছোটো ও অশিক্ষিত ব'লে আমরা আগে ধ'রে নিয়েছি, তারা আজ আর ছোটো নয়, অশিক্ষিতও নয়। একদিক থেকে পুরাতন মধ্যবিত্ত সমাজের সংকোচন, আবার অন্য দিক থেকে নূতন কর্মকুশল সমাজ গ'ড়ে উঠছে। এই নূতন সমাজের আদর্শ ভেদাভেদরহিত সমাজ গঠন। এই নূতন সমাজে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ অনুপযোগী হবে ব'লে আমার তো মনে হয় না। সমাজের অগ্রগতি সমাজান্তর্গত লোকেদের উৎসাহ উদ্দীপনা ও সৃজনীশক্তির উপর প্রধানত নির্ভর করে। ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কারণসমূহ কখনও কখনও সহায়তা করে মাত্র। জনসাধারণে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার তেমন ভালোভাবে কখনও করা হয়েছে ব'লে আমার মনে পড়ে না। পূর্বে যে চেষ্টা করা হয়েছিল তা সফলতা লাভ করেছে ব'লে মনে হয় না। সে চেষ্টার জন্য যে লোকের দরকার সমাজে সে লোকের অভাব। প্রচারের জন্য প্রয়োজন ধর্মজীবন, শুধু সদ্‌বক্তার দ্বারা সমাজের প্রচার হয় না।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য

ভারতের স্বাধীনতার প্রথম যুগে আজ আমরা প্রতিষ্ঠিত। নব নব কর্মপ্রচেষ্টা আজ আমাদের আহ্বান করছে। বর্তমান এই পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মসমাজের কি কর্তব্য? আমি জানি, ব্রাহ্মসমাজের অনেকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছেন। আজও ব্রাহ্মসমাজ নানাভাবে দেশহিতকর কাজে অংশ গ্রহণ করছেন। কিন্তু তবুও মনে হয়, অনেকটা নিস্তেজ ভাব এসে গিয়েছে—আগেকার সেই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা আর নেই, জড়তা এসে আমাদের হৃদয় অধিকার করেছে। দেশের ও দশের কাজে ব্রাহ্মসমাজ যেখানে অগ্রণী ছিলেন, সেখানে আজ ব্রাহ্মসমাজ শুধু Camp-follower।

আজকের দিনে সবচেয়ে বেশি আবশ্যক আমাদের সমাজের ঐক্য ও সংহতি। আমাদের সমাজ তিনটি শাখায় বিভক্ত। কি কারণে এই বিভেদের সৃষ্টি হ'ল সে আলোচনার অবতারণা এখানে করব না। সে আলোচনা বহুলাংশে অবান্তর ও নিরর্থক—বিশেষ ক'রে বর্তমান পরিস্থিতিতে। হয়তো standpoint অথবা emphasis-এর প্রভেদ আছে তিনটি শাখায়—এ ধরণের প্রভেদ একই সমাজের একই গোষ্ঠী-ভুক্ত লোকেদের মধ্যেও তো থাকে। কোনো মৌলিক বিভেদ আছে ব'লে তো আমার মনে হয় না। আমি কলকাতার বাইরে থাকি, সব কথা হয়তো জানি না, তিন সমাজের এক হবার আরো বাধা organisational অথবা constitutional হয়তো আছে। কিন্তু organisation অথবা constitution কি ধর্মের থেকে বড়ো স্থান অধিকার করবে? শুনেছি পূর্বে একবার চেষ্টা হয়েছিল তিন সমাজকে এক করবার। সে চেষ্টা কেন ব্যর্থ হয়েছিল জানি না। সময় আমাদের প্রতীক্ষায় ব'সে থাকবে

না। আবার সে চেষ্টা করবার সময় এসেছে ব'লে আমি মনে করি। এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একটি কথা মনে পড়ে, যা তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মাতাকে বলেছিলেন। তিনি একবার বলেছিলেন, "দেখ্ মা, ভায়ে ভায়ে দড়ি ধ'রে মাপে আর বলে, এ দিক্‌টা তোর, আর ঐ দিক্‌টা আমার, কিন্তু কার জায়গা মাপছে আর কেই বা নেয়, সেটা কিছু ঠিক করে না।" ঠিক সেই অবস্থা সাধারণ ও নববিধান সমাজের —এ দিক্‌টা আমার আর ও দিক্‌টা তোমার, কিন্তু কার জায়গা মাপছে তার ঠিকানা নেই। আজও কি আমাদের বলবার সময় আসে নি—

তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে।
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব, ধর্মজীবন গঠন ও ধর্মজীবনের জন্য centralised কোনো প্রতিষ্ঠান গঠন করা। বাংলাদেশে ও বাংলার বাইরে এখনও অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে সমাজ ও মন্দির রয়েছে কিন্তু লোক নেই। সমাজসেবীর, সমাজকর্মীর অভাব আমাদের সবচেয়ে বড়ো অভাব। যা-ও বা কয়েকজন আছেন তাঁরা আমাদের সমাজের কর্ম-প্রচেষ্টায় হয়তো বাধাগ্রস্ত অথবা ব্যাহত, কিংবা বৃহত্তর ক্ষেত্রে কাজ করাকেই শ্রেয় মনে করেন। অর্থের অভাব সত্যিকারের অভাব নয়, লোকের অভাবই সত্যিকার অভাব। প্রচার-ব্রতে যাঁরা ব্রতী রয়েছেন, তাঁদের প্রতি যে আমাদের কর্তব্য রয়েছে, সে সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন। সে ঔদাসীন্য যে কতদূর মর্মন্তুদ তা আমি স্বচক্ষে প্রচারাশ্রমের দৈনন্দিন ব্যবস্থায় দেখেছি। এ রকম ঔদাসীন্য অন্য কোনো ধর্মসমাজে দেখি নি। নানা লোকহিতকর প্রচেষ্টায় রামকৃষ্ণ-মিশন, ভারত-সেবাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান আমাদের থেকে এগিয়ে গেছেন। তার প্রধান কারণ অর্থবল নয়, লোকবল। যে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজকে দীক্ষিত করেছিল, সে দীক্ষা আমরা হারাতে বসেছি।

কি প্রবল শৈথিল্য ও ঔদাসীন্য যে আমাদের আঁকড়ে ধরেছে তার ইয়ত্তা নেই। মনে মনে অনেকেরই এই ভাব যে, প্রচার ও ধর্মজীবনে আর কিছু হবে না। শুধু যে আমাদের Secular State তা নয়, মনে হয় আমাদের ধর্মও যেন secular হয়ে যাচ্ছে। খাও দাও, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকো, without offence to any religion, সামাজিক rules of conduct কিছু মেনে চলো—ব্যস্, এই তো দুনিয়াদারি। এর উপর আর কিছু ভাববার নেই, ভগবান্ আছেন কি নেই এ দুশ্চিন্তায় মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এ ধরণের মনোবৃত্তি শুধু ব্রাহ্মসমাজে কেন অন্য সমাজে, অন্য দেশেও, বেশ প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। এ হচ্ছে পূর্ণভাবে লোকায়ত ধর্ম—hedonism-এর নামান্তর।

ধর্মের প্রধান ও প্রথম অন্তরায় উপরোক্ত মনোবৃত্তি। উর্দুতে একটি বয়েত আছে—

বেহেস্ত সে বেহতর্ ইনসান বন্‌না,
লেকিন্ উস্‌মে দিক্‌কত হ্যায় জায়দা।

স্বর্গের দেবদূত হওয়ার চেয়ে মানুষ হওয়া ভালো। কিন্তু মানুষের মতো মানুষ হওয়া বড়ো কঠিন। আজ ব্রাহ্মসমাজ সবাইকে আহ্বান করছে মানুষ হবার জন্য, বিশেষ ক'রে আহ্বান করছে নিজের সমাজের লোককে। Organisation, Constitution—এ সবই বাহ্য ও গৌণ, যতদিন পর্যন্ত না তাতে প্রাণের প্রতিষ্ঠা হয়। সে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার উৎসব এই সম্মিলনীতে সার্থক হোক, আজ আমাদের এই সম্মিলিত প্রার্থনা। আমরা যা পেয়েছি, তা হারালে চলবে না, এ কথা যেন ভুলে না যাই। যা পেয়েছি তা রাখতে হবে আমাদের বাঁচবার জন্য, মানুষের মতো বাঁচবার জন্য, দশের মঙ্গলের জন্য, দেশের ও জগতের কল্যাণের জন্য। যা পেয়েছি তাকে বাড়াতে হবে, তাকে সময়োপযোগী করতে হবে, তাকে বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টায় সঞ্চারিত করতে হবে, তাকে আত্মপ্রত্যয় ও সহজজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তাকে সকলের সামনে ধরতে হবে—তর্কে নয়, বক্তৃতায় নয়, আত্মবিশ্বাসে, ধর্মজীবনে ও দৈনন্দিন কর্মে। এই challenge আজ আমাদের সামনে।

এই challenge-এর জবাব আমাদের দিতেই হবে। তার জন্য চাই সর্বপ্রথমে আমাদের আদর্শের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস যদি না থাকে, তাহলে কোনো প্রচেষ্টাই সফল হবে না। তারপর চাই কর্মতৎপরতা, আগ্রহ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা। আজ সমাজ সেই সব কর্মীর প্রতীক্ষায় রয়েছেন, যাঁরা তৈরী করবেন মিলন-সেতু world of faith ও world of reality-র মধ্যে, যাঁরা জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধিকে করবেন কর্মে সঞ্চারিত ও ভক্তিতে সরস, যাঁরা বিশ্বাসকে নিয়ে আসবেন দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ আনন্দ-নিরানন্দের ভিতর, যাঁরা নির্ভয়চিত্তে বলবেন—

তার পরে তাঁরে নমি যিনি ক্রীড়াচ্ছলে
গড়েন নূতন সৃষ্টি প্রলয়-অনলে,
মৃত্যু হতে দেন প্রাণ, বিপদের বুকে
সম্পদেরে করেন লালন, হাসিমুখে
ভক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টক-কান্তারে
রিক্ত হস্তে শত্রুমাঝে রাত্রি-অন্ধকারে।
যিনি নানা কণ্ঠে কন নানা ইতিহাসে,
সকল মহৎ কর্মে, পরম প্রয়াসে,
সকল চরম লাভে, "দুঃখ কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব ভয়।
... ...
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির।
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির॥"